বন্দুকের মুখে দাঁড়িয়ে আমার মুকিত বলে ওঠে 'জয় বাংলা'

শফিকুন্নেছা খাতুন

আমার জীবনের অবর্ণনীয় কষ্টের সময়টা হচ্ছে ১৯৭১ সাল। আমার ১০ ছেলেমেয়ের মধ্যে আবদুল মুকিত চতুর্থ। একাত্তরে মৌলভীবাজার মহাবিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল। মুকিত ছিল ছাত্রলীগের নেতা। সারাক্ষণ সঙ্গীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকত। রাজনীতি নিয়ে কথা বলত।

পাকিস্তানি সেনারা ২৬ মার্চেরআগেই মৌলভীবাজার শহরে অবস্থান নেয়। তখন থেকেই আমি মুকিতের মধ্যে অস্থিরতা দেখতে পাই। দিনের পর দিন সে বাসায় ফিরত না। পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধের ডাকে যে দুটি মিছিল হয়েছিল শুনেছি, এর একটিতে মুকিতও ছিল।

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের শমসেরনগরে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হলো। হানাদাররা মার খেয়ে সিলেটে পালাল। মৌলভীবাজারে পাকিস্তানি সেনারাও পালিয়ে গেল। এখানে সি আর দত্ত, এমপি ফরিদ গাজী, কর্নেল ওসমানীসহ আরো অনেকে এলেন। আমাদের বাসার কাছে পিটিআই। সেখানে তাঁরা ক্যাম্প করলেন। কর্নেল ওসমানী মুকিতের বাবা মছদ্দর আলীকে চিনতেন। একদিন বাসায় এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন। পিটিআই ক্যাম্পের টেলিফোন অপারেটরের দায়িত্ব দিলেন তাঁকে। কিছুদিন পর শুরু হলো শেরপুরের যুদ্ধ। একটানা তিন দিন চলল এই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা পরাজিত হয়ে ফিরতে লাগল। আমরা ভারতে চলে গেলাম। সেটা এপ্রিল মাসের শেষ দিকের কথা। আমার আবদুল মুকিত আগেই ভারতে চলে গিয়েছিল। আমরা ভারতে যাওয়ার পরও ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। যুদ্ধে যেতে বাধা দেব এই ভয়ে সে আমার সামনে আসত না।

মুকিত শহীদ হওয়ার খবর আমি জানতে পারি দেশ স্বাধীন হওয়ার চার দিন পর। ভারত থেকে দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এই সময়ে খবর পেলাম, আমার মুকিত আর নেই। এই খবর শোনার পর আমার কী অবস্থা হয়েছিল, তা আজ আর স্মরণ নেই। দেশে ফেরার পর তাঁর সাথিদের কাছে শুনেছি আমার মুকিত কিভাবে শহীদ হয়েছে।

ভারতে ট্রেনিং শেষ করে সেপ্টেম্বর মাসে মুকিত বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে ঢোকে। সে ছিল গ্রুপের ডেপুটি প্রধান। তারা শ্রীমঙ্গলের একটি ছনখোলার ভেতরে আশ্রয় নেয়। তাদের গ্রুপেরই একজন গোপনে রাজাকারদের কাছে আত্মসমর্পণ করে মুকিতদের অবস্থান বলে দেয়। পাকিস্তানি হানাদাররা ঘেরাও করে আমার মুকিতসহ আরো ছয়জনকে ধরে ফেলে। হায়েনারা পরে ওদেরকে শ্রীমঙ্গলের বর্তমান বিজিবি ক্যাম্পের কাছে একটি বটগাছের নিচে এনে গুলি করে মেরে ফেলে।

মুকিত ছিল খুব সাহসী। শুনেছি, মারার আগে পাকিস্তানি এক ক্যাপ্টেন মুকিতের সঙ্গে কথা বলার সময় গালি দেয়। তখন মুকিত বলে, 'তুমি যেমন ক্যাপ্টেন, আমিও মুক্তিযোদ্ধাদের একটি গ্রুপের ক্যাপ্টেন। আমার সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলো।' এও শুনেছি, আমার মুকিতকে গুলি করার আগে বলেছিল 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলতে। মুকিত বলেছিল 'জয় বাংলা'।

আমার ছেলেকে মেরে হানাদাররা কবর দিয়েছিল, না লাশ কোথাও ফেলে রেখেছিল, তা আজও জানি না। যে স্থানে মেরেছে, সেখানে যে কতবার গেছি আমার বুকের ধনের গায়ের গন্ধ পাওয়ার জন্য! সারাক্ষণ চোখে ভাসত আমার মুকিতের চেহারা। প্রথম কয়েক মাস তো আমি পাগলের মতো ছিলাম। মুকিতের শোকে মনমরা থাকতে থাকতে ওদের বাবা ১৯৭৯ সালে মারা গেছেন।

আমার বয়স এখন প্রায় ৮৫ বছর। আর্থিক অসচ্ছলতা নেই। শহীদ আবদুল মুকিতের মা হিসেবে সরকার থেকে ভাতা পাচ্ছি। কিন্তু একটাই দুঃখ, মুকিতের স্মৃতি স্মরণীয় করে রাখতে সরকার উদ্যোগ নেয়নি। মৌলভীবাজার পৌরসভা কর্তৃপক্ষ অবশ্য একটি পাড়ার সড়ক মুকিতের নামে করেছে।

আর মুক্তিযোদ্ধা নামের যে বিশ্বাসঘাতক রাজাকারদের কাছে খবর পাচার করেছিল, সেসহ তার দোসরদের অনেকেই আজও জীবিত। বর্তমান সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেছে। মরার আগে ওই সব রাজাকারের বিচার দেখে যেতে চাই।

শফিকুন্নেছা খাতুন : শহীদ আবদুল মুকিতের মা। মৌলভীবাজার জেলা শহরের দক্ষিণ কলিমাবাদ এলাকায় নিজ বাসভবনে বসবাস করেন।
অনুলিখন : আবদুল হামিদ, সাংবাদিক ও ছাড়াকার, মৌলভীবাজার।
(দৈনিক কালের কণ্ঠ থেকে সংকলিত)